একক ৪৩ ❐ ঔপনিবেশিক অভিঘাত : নতুন প্রশাসনিক কাঠামো : আইন-বিচার ব্যবস্থা—দণ্ডবিধি—শিক্ষাব্যবস্থা

গঠন ঃ

৪৩.০ উদ্দেশ্য
৪৩.১ প্রস্তাবনা
৪৩.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট
৪৩.৩ পিটের ভারত-আইন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ
৪৩.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা
৪৩.৪.১ বাংলা : প্রথম পর্ব (১৭৬৫-১৭৯৩)
৪৩.৫ রাজস্ব সংস্কার
৪৩.৬ প্রশাসনিক সংস্কার
৪৩.৭ বিচারব্যবস্থা
৪৩.৮ শিক্ষা-সংক্রান্ত নীতি
৪৩.৯ সারাংশ
৪৩.১০ অনুশীলনী
৪৩.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৪৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- ঔপনিবেশিক অভিঘাতের ফলে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল।
- রেগুলেক্টিং অ্যাক্ট কিভাবে কোম্পানির শাসনের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ এনেছিল।
- পিটের ভারত-আইন এই নিয়ন্ত্রণকে কিভাবে সুদৃঢ় করেছিল।
- রাজস্ব ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা এবং শিক্ষাব্যবস্থায় কি কি সংস্কারসাধন করা হয়েছিল।

৪৩.১ প্রস্তাবনা

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করার পর (১৭৬৫ খ্রিঃ) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামনে একটা বড় সমস্যা দেখা দিল। প্রশ্ন হল একটি বেসরকারি

বাণিজ্যিক সংস্থা ব্রিটিশ পার্লামেনন্টের তত্তাবধান ছাড়া কীভাবে এতবড় একটি ভূখণ্ডের প্রশাসন চালাবে ? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিজস্ব সংবিধান প্রাচ্য দেশীয় একটি সাম্রাজ্য পরিচালনার পক্ষে কতটাই বা উপযোগী ? পার্লামেন্টের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যেই এ-ব্যাপারে নানা তর্ক-বিতর্ক ছিল। শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্ট ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেগুলেক্টিং অ্যাক্ট (Regulating Act) পাশ করে এইসব প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করে। রেগুলেটিং অ্যাক্টের মাধ্যমে কোম্পানির উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। কোম্পানির গঠনতন্ত্রও এর ফলে পরিবর্তিত হল।

৪৩.২ রেগুলেটিং অ্যাক্ট

এই আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানির অংশীদারদের সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার ক্ষুণ্ণ করল। কোম্পানির চব্বিশজন ডিরেক্টর, যাঁরা প্রতিবছরই নির্বাচিত হতেন, এখন থেকে চার বছরের জন্য নির্বাচিত হলেন। এদের এক-চতুর্থাংশ প্রতিবছর অবসর নেবেন স্থির হল। এই আইনে আরও স্থির হল যে ভারত থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র ট্রেজারীর কাছে পেশ করতে হবে। সামরিক এবং বেসামরিক বিষয়ে সমস্ত চিঠিপত্র ও তথ্য সেক্রেটারি অব স্টেট-এর কাছে পেশ করতে হবে। সুতরাং এইভাবে এই প্রথম কোম্পানির কাজকর্মের উপর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হল।

কোম্পানির ভারতবর্ষীয় সাম্রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারেও এই আইন কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিল। বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হলো একজন গভর্ণর জেনারেল এবং চারজন সদস্যের এক কাউন্সিলের উপর। কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে স্থির হল। কোন ব্যাপারে কাউন্সিলে দু'পক্ষের সমান সমান ভোট হলে সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট একটি অতিরিক্ত ভোট (casting vote) দিয়ে তার মীমসা করবেন বলে বলা হল। এই আইন অনুসারে প্রথম গভর্ণর-জেনারেল হলেন ওয়ারেন হেস্টিংস এবং চারজন কাউন্সিলার হলেন ক্ল্যাভারিং (Clavering), মনসন (Monson), বারওয়েল (Barwell) এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস (Philip Francis)। স্থির হল এঁদের উত্তরসূরীরা কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হবেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্টে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জন্যও একজন গভর্ণর ও কাউন্সিলের ব্যবস্থা হয়েছিল। সাধারণ প্রশাসনিক ব্যাপারে এই দুই প্রেসিডেন্সি কলকাতা প্রেসিডেন্সির থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল ; কিন্তু স্থির হল যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপনের ব্যাপারে এই দুই প্রেসিডেন্সি বাংলার গভর্ণর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের অধীনে থাকবে। তাছাড়া, এই আইনে একটি সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হল। একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিনজন সাধারণ বিচারপতিকে নিয়ে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল সুপ্রীম কোর্ট। স্যার ইলিজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ত্রুটিযুক্ত ছিল না। বস্তুত সুপ্রীম কোর্টের এলাকা, বাংলার সরকারের সঙ্গে এই কোর্টের সম্পর্ক কিংবা গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের আইনে কোন সুস্পষ্ট বিধান ছিল না। বস্তুত রেগুলেটিং অ্যাক্টের প্রধান অংশ ছিল দু'টি—একটি কোম্পানির গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করতে চেয়েছিল প্রধানত ডিরেক্টরদের কার্যকালের মেয়াদের নিরাপত্তা

দিতে আর কোম্পানির আভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচালনব্যবস্থা উৎসাহিত করতে। কিন্তু ডিরেক্টর সভা আর ভারতে ইংরেজ শাসকদের গোষ্ঠীবিরোধ সে-উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তাছাড়া মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর কলকাতা প্রেসিডেন্সীর কর্তৃত্ব এই আইনে সসুনির্দিষ্ট না থাকায় এই দুই প্রেসিডেন্সী কার্যত স্বাতন্ত্র্য নিয়েই শাসনকার্য চালাতে থাকে। এর ফলে শুধুমাত্র প্রশাসনিক জটিলতাই বাড়েনি, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপনের ব্যাপারেও নানা পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত ডিরেক্টর সভাকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। উপরন্তু, গভর্ণর-জেনারেলের প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁর কাউন্সিল ও সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় শাসনকার্যে অনেক সময় অবাঞ্ছিত অসুবিধের সৃষ্টি হয়। বিচারকার্যেও নানা জটিলতা বাড়ে, কেননা সুপ্রীম কোর্ট বিচার পরিচালনা করত ইংল্যান্ডের আইন মোতাবেক ; অন্যদিকে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত বিচার করত গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল রচিত ভারতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন অনুসারে। সুতরাং এককথায় বলা যেতে পারে, রেগুলেটিং অ্যাক্টের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ কিন্তু এর পরিবেশনা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও, এই আইন একেবারে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এমন কথা বলা যায় না। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ রেগুলেটিং অ্যাক্ট ছিল প্রথম লিখিত সংবিধান। বলা যেতে পারে, কোম্পানির হাত থেকে পার্লামেনন্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক ভারতে লক্ষ্য করা যায় এখানেই তার সূচনা হয়েছিল।

৪৩.৩ পিটের ভারত আইন, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ

রেগুলেটিং অ্যাক্ট কার্যকর ছিল ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, এগারো বছর। এই সময়কালের মধ্যে এই আইনের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোম্পানির ভারতীয় প্রশাসনে নানা দিক থেকে ব্যর্থতা পার্লামেন্টকে বিব্রত করে। ইতিমধ্যে আমেরিকার ঔপনিবেশগুলির সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। আর্থিক অনটনে উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার ভাবতে শুরু করে কীভাবে ভারতবর্ষ থেকে রাজস্ব আমদানি করে এই আর্থিক সঙ্কটের নিরসন করা যায়। ১৭৮৩ খ্রিঃ নাগাদ কোম্পানি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানালে কোম্পানির গঠনতন্ত্র সম্পর্কে পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে ওঠে, কেননা বার্ক প্রমুখ অনেকে দাবি জানালেন যে, কোম্পানির গঠনতন্ত্রের সংস্কার ব্যতীত অর্থ বরাদ্দ করা উচিত হবে না। প্রধানত কোম্পানির উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যেই রাজা তৃতীয় জর্জের হস্তক্ষেপে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রী পিট পার্লামেন্টে একটি বিল নিয়ে এলেন এবং ঐ বছরই 'পিটের ভারত আইন' নামে তা পাশ হল।

পিটের ভারত-আইন অনুসারে ছ'জন কমিশনারের উপর ভারতবর্ষের প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা হল। এঁরা হলেন, একজন রাষ্ট্রসচিব (Secretary of State), ব্রিটিশ অর্থসচিব (Chancellor of the Exchequer) এবং ইংল্যান্ডের রাজার মনোনীত চারজন প্রিভি কাউন্সিলার (Privy Councillors)। এদের নিয়ে গঠিত হল বোর্ড অব কন্ট্রোল (Board of Control)। বোর্ড অব কন্ট্রোলের হাতে অর্পিত হল কোম্পানির সামরিক ও অ-সামরিক দায়-দায়িত্ব। কোম্পানির যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করার

অধিকার ছিল এঁদের। বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয় ভিন্ন যাবতীয় চিঠিপত্র বোর্ড অব কন্ট্রোলের অনুমতিসাপেক্ষ ছিল। অংশীদার-সভার (Court of Proprietors) ক্ষমতা রীতিমতো হ্রাস করা হল। কারণ বোর্ড অব ডিরেক্টর-এর কোন সিদ্ধান্ত বোর্ড অব কন্ট্রোলের কমিশনাররা অনুমোদন করলে তা অংশীদার-সভা বাতিল বা রদ করতে পারত না।

পিটের ভারত-আইন ভারতীয় প্রশাসনের কিছু পরিবর্তন নিয়ে এল। গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা তিনজনে কমিয়ে আনা হল। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের ককর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে ক্ষেত্রবিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলারদের অভিমতের বিরুদ্ধে গভর্ণর-জেনারেলকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল। পিটের ভারত-আইনে বলা হল, রাজ্যজয় ও সাম্রাজ্য বিস্তার ইংল্যান্ডের জাতীয় মর্যাদা ও নীতি বহির্ভুত।

পিটের ভারত-আইন সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ জাতীয় নীতির অন্যতম হাতিয়ারে পরিণত হল। ভারতবর্ষ ব্রিটেনের যাবতীয় শাসকশ্রেণীর অন্যতম স্বর্ণমৃগয়ার ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হল। কোম্পানিও সন্তুষ্ট হলো, কেননা তার ভারতবর্ষীয় ও চীনদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার রক্ষিত হয়েছিল। কোম্পানির ডিরেক্টররাও খুশী হলো, কারণ তাদের হাতে ভারতে বিরিটিশ অফিসারদের নিয়োগ ও পদচ্যুতির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।

পিটের ভারত-আইন এদেশে একটি সাধারণ প্রশাসন কাঠামো প্রবর্তন করেছিল যা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মূলগতভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। তবে এই সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন প্রশাসনিক পরিবর্তন আনা হয়েছিল আর তার ফল হয়েছিল এই যে কোম্পানির ক্ষমতা ও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসছিল। সংক্ষেপে সেইসব প্রশাসনিক পরিবর্তনগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1793) মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপর গভর্ণর-জেনারেলের কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় হল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনে (Charter Act of 1813) চীন দেশে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার বহাল রইল ঠিকই, কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্য এখন থেকে সকগলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1833) চীনদেশের সঙ্গেও কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার রদ করা হল। কোম্পানি কার্যত বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এখন থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ভারতের প্রশাসনিক কাজডকর্ম বোর্ড-অবৃকন্ট্রোলের কঠোর তত্ত্বাভধানে কোম্পানির মাধ্যমেই পরিচালিত হতে লাগল। তবে এই আইনে ভারতীয় শাসনতন্ত্রেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হল। বাংলার গভর্ণর এখন থেকে সমগ্র ভাররে গভর্ণর-জেনারেল ও বাংলার গভর্ণর বলে পরিচিত হলেন। গভর্ণর-জেনারেল কাউন্সিলে একজন আইন-সদস্য (Law member) নিযুক্ত করা হল। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন-প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতার পৃথকীকরণের সূচনা হল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ-আইনে (Charter Act of 1853) আরও পরিবর্তন আনা হল। ডিরেক্টরদের সংখ্যা কমিয়ে করা হল আঠারো। এদের মধ্যে তিনজনকে (পরে ছ'জনকে) নিযুক্ত করবেন ব্রিটেনের রাজা। বোর্ড-অব-কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্টের বেতন রাষ্ট্রসচিবের সমতুল্য করা

হল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিলারদের নিয়োগ এখন থেকে রাজার অনুমোদনসাপেক্ষ হল।

মোটকথা, পার্লামেন্টের বিভিন্ন সনদ-আইনের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির প্রশাসনকে পুরোপুরি ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হল। আবার একথাও স্বীকার করা হল যে দৈনন্দিন শাসনকার্য ছ'হাজার মাইল দূর থেকে প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করা ব্রিটেনের রাজার পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হল পার্ষদ গভর্ণর-জেনারেলের হাতে (Governor-General-in-Council)। গভর্ণর-জেনারেলই, যিনি যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে নাচক করতে পারতেন, ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে প্রকৃত সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন।

৪৩.৪ প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

৪৩.৪.১ বাংলা : প্রথম পর্ব (১৭৬৫-১৭৯৩)

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে যদিও কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, রাজস্ব আদায়ের প্রকৃত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দু'জন নায়েব-দেওয়ানের হাতে—রেজা খাঁকে বাংলায় আর সিতাব রায়কে বিহারে। যা রাজস্ব আদায় হত তার থেকে কোম্পানি ভারত সম্রাটকে দিত ২৬ লক্ষ টাকা আর ৩২ লক্ষ টাকা দিত বাংলার নবাবকে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন করার জন্য। বাকী অর্থ কোম্পানি নিত নিজস্ব ব্যয়-নির্বাহের জন্য।এটিই ছিল ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসন।

কী কোম্পানি, কী দেশীয় জনসাধারণ উভয়ের পক্ষেই দ্বৈত-শাসনের ফল হয়েছিল মারাত্মক। এই ব্যবস্থায় নায়েব-দেওয়ানরা অবশ্য অবৈধভাবে প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিল। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন। তাই ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে তারা হেস্টিংসকে বাংলার গভর্ণর নিযুক্ত করে পাঠালেন এই অব্যবস্থা দূর করার জন্য। হেস্টিংস দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটালেন এবং দেওয়ানী শাসন পরিচালনার ভার কোম্পানির হাতে ন্যস্ত করলেন। নায়েব-দেওয়ানের পদও বিলুপ্ত করা হল ; বাংলার নায়েব রেদা খাঁ ও পাটনার নায়েব সিতাব রায়কে পদচ্যুত করা হল। সরকারি কোষাগার কলকাতায় স্থানান্তরিত হল। নবাবের বাৎসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ১৬ লক্ষ টাকায় হ্রাস করা হল। হেস্টিংস মীরজাফরের বিধবা পত্নী মুনী বেগমকে নবাবের অভিভাবক আর মহারাজা নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাসকে নবাবের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। এইসব ব্যবস্থার ফলে প্রশাসনের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব কোম্পানির হাতেই বর্তাল। আর মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলকাতা হয়ে উঠল কোম্পানি-প্রশাসনের প্রকৃত কেন্দ্রস্থল।

প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব হাতে নিয়ে হেস্টিংস একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। কাজটি সহজ ছিল না, কেননা কোম্পানির প্রশাসন যন্ত্র এ-যাবৎ শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল। এখন তাকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন হল। কোম্পানির কর্মচারীদের মনোবলও তেমন ছিল না। এদেশে পাবলিক সার্ভিসের ট্রাডিশনও গড়ে ওঠেনি। এদেশীয় ভাষা, আচার, ব্যবহার জনসংযোগের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই বাংলায় ব্রিটিশ সরকারকে রীতিমতো অসুবিধেজনক

পরিস্থিতির মধ্যে এই প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই কুড়িবছর সময়কালে হেস্টিংস এবং কর্ণওয়ালিস নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একটি ইন্দো-ব্রিটিশ শাসন-কাঠামো বাংলায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। এই শাসন-কাঠামোর মুখ্য দুটি দিক হল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও বিচার পদ্ধতি। প্রশাসনের এই মুখ্য দুটি বিষয় কীভাবে এই দুই গভর্ণর-জেনারেলের আমলে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হল তা সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

৪৩.৫ রাজস্ব সংস্কার

কোম্পানির রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের ভার ছিল দু'জন নায়েব-দেওয়ানের উপর। ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে হেস্টিংস নায়েব-দেওয়ান পদের বিলুপ্তি ঘটিয়ে কিছু পরিদর্শক (Supervisor) নিয়োগ করেছিলেন। পরিদর্শকদের উপর দায়িত্ব ছিল প্রচলিত রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার। পরিদর্শকরা তাদের কাজে ব্যর্থ হলে রাজস্ব প্রশাসনব্যবস্থা রাজস্ব বোর্ডের (Board of Revenue) হাতে দেওয়া হয়। জমির খাজনা আদায়ের জন্য পাঁচ বছরের ব্যবস্থায় নিলাম ডাকা হয়। একজন কালেক্টর এবং একজন ভারতীয় দেওয়ানের মাধ্যমে প্রতি জেলায় রাজস্ব প্রশাসনের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা করা হয়।

এই ব্যবস্থার ফলাফল হয়েছিল নানা দিক থেকে ভয়াবহ। অসাধু ফাটকাবাজরা জমিদারী পাবার আশায় চড়া নিলামে জমিদারী কিনে নেয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় পুরানো জমিদারদের হটিয়ে দেয়। কিন্তু প্রতিশ্রুতিমত রাজস্ব আদায়ে তারা ব্যর্থ হয়। এইসব ভুঁইফোড় জমিদারদের জমিতে কোন স্থায়ী স্বার্থ ছিল না ; তাই নির্দিষ্ট মেয়াদকালের মধ্যে তারা রায়তদের অপরিসীম শোষণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও তাদের খাজনা বকেয়া পড়ে যায় ; কালেক্টররা এদের অনাদায়ী খাজনার দায়ে গ্রেপ্তার করে। এইভাবে জমিদার ফাটকাবাজ, রায়ত সকলেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কোম্পানিও আর্থিক দুর্গতিতে পড়ে। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা করা হল। রাজস্ব বোর্ডের দু'জন সদস্য ও কোম্পানির তিনজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারীদের নিয়ে কলকাতায় একটি রাজস্ব কমিটি (Committee of Revenue) গঠন করা হল। ইয়োরোপীয় কালেক্টরের পদ তুলে দেওয়া হল এবং প্রতি জেলায় রাজস্ব প্রশাসনের যাবতীয় দায়দায়িত্ব একজন করে ভারতীয় দেওয়ানের হাতে ন্যস্ত হল। ছ'টি প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হল আর বিশেষ কমিশনারের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটি মাঝেমধ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হল।

এইসব পরিবর্তনের ফলে অবস্থার যে খুব উন্নতি হল তা নয়। তাই এই ব্যবস্থায় পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হলে আবার বাৎসরিক মেয়াদে জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হল। পুরানো জমিদাররা যাতে নিলামে জমির ইজারা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য প্রাদেশিক কাউন্সিলগুলিকে বিশেষ নজর দিতে বলা হল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে আবার একটি নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হল। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব প্রশাসনের পুরো ব্যাপারটি কলকাতায় কেন্দ্রীভূত করা হল। একটি নতুন রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করা হল। প্রাদেশিক

কাউন্সিলগুলি তুলে দেওয়া হল আর প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর নিয়োগ করা হল ঠিকই, তবে তাদের ক্ষমতা হ্রাস করা হল।

এই ব্যবস্থা অতি-কেন্দ্রীকরণের সমস্ত কুফল নিয়ে ভেঙ্গে পড়ল। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আরও একটি কার্যকরী ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। জেলাগুলিকে এখন থেকে রাজস্ব প্রশাসনের একেকটি একক হিসাবে গণ্য করা হল। কালেক্টরদের দায়িত্ব দেওয়া হলো অনেক বেশি ; রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় জেলাস্তরের দায়িত্ব এখন কালেক্টরদের উপরই বর্তাল। প্রথমে সারা বাংলাদেশকে ৩৫টি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছিল কিন্তু ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাজ এর সংখ্যা কমিয়ে করা হল ২৩টি। রাজস্ব-কমিটি পুনর্গঠিত হয়ে রাজস্ব বোর্ড নামে পরিচিত হল। এর সভাপতি হলেন কাউন্সিলেরই একজন সদস্য। বোর্ডের কাজকর্মের পরিধি সুনির্দিষ্টবাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হল. প্রধান সেসরেস্তাদার নামে একজন নতুন অফিসারের উপর রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হল। এ-কাজটি আগে কানুনগোর নিজস্ব ব্যাপার ছিল।

বাৎসরিক জমির বন্দোবস্ত ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলেছিল। এটি ছিল নিতান্তই সাময়িক ব্যবস্থা। জমিতে জমিদারদের আরও স্থায়ী বন্দোবস্ত দেবার কথা বিবেচনা করা হচ্ছিল। কিন্তু জমির মালিকানা বা স্বত্ব নিয়ে পরস্পরবিরোধী নানা মতামত ও তর্কবিতর্ক চলছিল বলে জমিতে স্থায়ী স্বত্বদানের বিষয়টি কার্যকরী হতে দেরী হচ্ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে যে জমির চিরস্থায়ী স্বত্বদানের ব্যাপারটি আছে তা কোম্পানির বিভিন্ন অফিসাররা ইতিমধ্যেই প্রচার করে আসছিলেন। এদের মধ্যে আমরা আলেকজান্ডার ডাও (Alexander Dow), হেনরি পাত্তুলো (Henry Pattullo) কিংবা ফিলিপ ফ্রান্সিক-এর (Philip Francis) নাম করতে পারি। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের পিটের ভারত-আইনেও এই ধারণাটি অস্পষ্ট আকারে ছিল। এরপর ১৭৯৮-৯০ খ্রিস্টাব্দে কর্ণওয়ালিস যখন দশসালা বন্দোবস্ত করলেন তখন তাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

বিষয়টি সম্পর্কে নানা তর্ক-বিতর্ক শেষপর্যন্ত গ্রান্ট-শোর কেন্দ্রীভূত হল। কর্ণওয়ালিস প্রচলিত রাজস্বের পরিমাণ, বিভিন্ন অঞ্চলের জমির মূল্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য জন শোরকে (John Shore) দায়িত্ব দেন। শোর টোডরমলের আমল থেকে মীরকাশিমের আমল পর্যন্ত বাংলার রাজস্ব বন্দোবস্তের নানা দিক পর্যালোচনা করে ঘোষণা করেন যে জমিদারই প্রকৃত জমির মালিক, বংশানুক্রমিক তারা তাদের ভূসম্পত্তির উপর মালিকানা বজায় রেখেছে, তাই সরকার তাদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না। সুতরাং পূর্বতন জমিদারদের সঙ্গেই জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। অন্যদিকে জেমস গ্রান্ট (James Grant) ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, মুঘল আমলে মুঘল সরকারই ছিলেন জমির প্রকৃত মালিক ; জমিদারদের তাঁরা কেবল জমির খাজনা আদায়ের দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

নানা তর্ক-বিতর্কের পর শেষ পর্যন্ত ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। এই ব্যবস্থার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল : প্রথমত, জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীরা ভূস্বামী (landlord) বলে পরিগণিত হলেন। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে রাজস্ব আদায়

করার অধিকার তো তাঁরা পেলেনই, উপরন্তু নিজের নিজের জমিদারী এলাকায় সমগ্র জমির মালিক বলে তাঁরা আইনসঙ্গত স্বীকৃতি পেলেন। এই মালিকানা-স্বত্ব বংশানুক্রমিক বলে স্বীকৃতি পেল ; জমি হস্তান্তর করার অধিকারও জমিদাররা পেল। অন্যদিকে কৃষকরা নিছক রায়তে পরিণত হল ; জমির উপর দীর্ঘকালের সাবেকী অধিকার থেকে রায়তরা বঞ্চিত হল। গোচারণ ক্ষেত্র, খাল-বিলে মৎস্য চাষ কিংবা আবাদী জমির উপর তাদের সাবেককালের অধিকারও চলে গেল। তারা পুরোপুরি জমিদারদের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে যে খাজনা আদায় করত তার $^{১০}/_{১১}$ অংশ ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হত আর অবশিষ্ট $^{১}/_{১১}$ অংশ জমিদার নিজের কাছে রাখত। খাজনাদানের এই বিধিব্যবস্থা বরাবরের জন্য স্থির হয়েছিল। জমিদরা যদি তার জমির আয়তন বাড়াতে পারত, কিংবা কৃষির উন্নয়ন ঘটাতে পারত, কিংবা প্রজাদের কাছ থেকে নির্ধারিত খাজনার থেকেও বেশি আদায় করতে পারত তাহলে সেটি হত তার নিজের আয়। রাষ্ট্র আর নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত দাবি করতে পারত না। তবে রাষ্টে
র কোষাগারে জমিদরাকে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই খখাজনা জমা দিতে হত। অন্যথায় জমিদারের জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত।

প্রথমের দিকে জমিদারদের দেয় রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল খুবই চড়া হারে। কোম্পানির অফিসারদের লক্ষ্যই ছিল কীভাবে সবচেয়ে বেশি খাজনা আদায় করা যায়। ১৭৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ সময়কালের মধ্যে খাজনার দাবি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। জন শোর হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে বাংলার কৃষি উৎপাদন যদি ১০০ ধরা হয় তাহলে সরকারের দাবি ছিল ৪৫। জমিদারদের পাওনা হতো ১৫ আর বাকি ৪০ পেত প্রকৃত কৃষক। অত্যন্ত চড়া হারে ভূমিরাজস্ব নির্ধারিত হওয়ার ফলে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দ-এর মধ্যে বাংলার অর্ধেক জমিদারীই বিক্রি হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে সরকারি আমলারা বুঝতে পেরেছিলেন যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে বাংলা ও বিহারের জমিদাররা অধিকাংশ জমির ক্ষেত্রেই জমির স্বত্বাধিকার ভোগ করতেন না। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার তাদের জমিতে স্থায়ী স্বত্বদান করলেন কেন তার কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে। একটি ব্যাখ্যার মেনে নেওয়া হয় যে ব্যাপারটি ভুল বোঝাবুঝি থেকেই ঘটেছিল। ইংল্যাণ্ডে ঐ সময় ভূমিব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল জমিদার আর ব্রিটিশ আমলারা ভারতীয় জমিদারদের ব্রিটিশ জমিদারদেরই সংস্করণ ভেবেছিল। কিন্তু অনন্তত একটি ব্যাপারে ভারতীয় ও ব্রিটিশ জমিদারদের মধ্যে প্রবল পার্থক্য ছিল। ব্রিটেনের জমিদার শুধুমাত্র রায়তের সঙ্গে সমম্পর্কের প্রশ্নেই জমির মালিক ছিল না, রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নেও জমির প্রকৃত মালিক ছিল। কিন্তু বাংলার জমিদার সে-অর্থে শুধুমাত্র রায়তের কাছেই জমিদার ; রাষ্ট্রের কাছে সেও ছিল প্রজামাত্র। বস্তুত কোম্পানির কাছে বাংলার দজমিদার বড় রায়তে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটেনের জমিদার রাষ্ট্রকে তার আয়ের স্বল্পাংশ দিত ট্যাক্স হিসেবে। পক্ষান্তরে বাংলার জমিদার রাষ্ট্রকে দিত তার আয়ের $^{১০}/_{১১}$ অংশ। তাকে জমির মালিক মনে করা হলেও, জমিদারকে জমি থেকে উৎখাত করা যেত যদি সে তার বাৎসরিক দেয় খাজনা যথাসময়ে সরকারকে জমা দিতে ব্যর্থ হত।

আবার বেশকিছু ঐতিহাসিক বাংলার জমিদারদের জমির মালিকানা দেওয়ার পিছনে গভীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করেছেন। এখানে প্রধানত, তিনটি বিষয় ক্রিয়াশীল ছিল। প্রথমটি বিশুদ্ধ রাষ্ট্রকৌশল থেকে উৎসারিত হয়েছিল। কোম্পানি এদেশে রাজনৈতিক মিত্রগোষ্ঠী অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে যেহেতু তাঁরা এদেশে বিদেশী তাই এদেশে অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠছীর সক্রিয় সমর্থন ও সাহায্য প্রয়োজন। আঠারো শতকের শেষের দিকে বেশ কয়েকটি গণবিক্ষোভ কোম্পানিকে এ-জাতীয় ভাবনায় প্রণোদিত করেছিল। তাই কোম্পানি একটি সুবিধাভোগী ও সম্পদশালী গোষ্ঠী তৈরি করেছিল জমিদারশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে, যারা নিজেদের সুযোগসুবিধা ও ভূমিজ স্বার্থ সুরক্ষার জন্যই ব্রিটিশকে এদেশে সুস্থির প্রতিষ্ঠায় রাখতে উৎসাহী হয়েছিল। দ্বিতীয়ত বিষয়টি ছিল অর্থনৈতিক এবং সম্ভবত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত কোম্পানির কোন সুস্থির আয়ের উৎস ছিল না যার উপর নির্ভর করে তারা এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যে পুরোপুরি উদ্যোগী হতে পারে। কোম্পানিকে সবসময়ই আর্থিক সকটের মধ্যে থাকতে হ'ত কেননা বাংলার ভূমিরাজস্বের অনেকটাই ব্যয় হয়ে যেত যুদ্ধবিগ্রহে, বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর প্রশাসন বাবদে কিংবা রপ্তানিযোগ্য পণ্য খরিত করতে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবসত্রে ফলে কোম্পানির আয়ে একটি স্থিরতা এল। উপন্তু কোম্পানি তার আয়ও এই সুবাদে বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল, কেননা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ভূমিরাজস্বের দাবি আগের থেকে অনেক বেশিই নির্ধারিত হয়েছিল। গুটিকয়েক জমিদারের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় পদ্ধতি লক্ষ লক্ষ রায়তের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের চেয়ে সহজতর ও কম ব্যয়সাপেক্ষ হয়েছিল। তৃতীয়ত, আশা করা গিয়েছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ভূমিরাজস্ব যেহেতু বরাবরের জন্য নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল এবং অদূর ভবিষ্যতে যেহেতু ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না, তাই জমিদাররা চাষ-আবাদ আরও বৃদ্ধি করতে উৎসাহী হয়েছিল, কেননা জমিদার জমি সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বাড়ালেও সে বর্ধিত আয়ে কোম্পানির হক ছিল না।

চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত পরবর্তীকালে উড়িষ্যা, মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চলের জেলায় এবং বারাণসীতে সম্প্রসারিত হয়েছিল। মধ্যভারতের কয়েকটি অঞ্চলে এবং অযোধ্যাতে ব্রিটিশ সরকার কিছুদিনের জন্য একটি ভূমিব্যবস্থার প্রচলন করেছিল যাতে জমিদারদের জমির মালিকানা দেওয়া হল কিন্তু ভূমিরাজস্বের পরিমাণ কিছুদিন অন্তর পরিবর্তন করা হত।

দক্ষিণভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হলে ভূমিব্যবস্থার নতুন সমস্যা দেখা দিল। ব্রিটিশ সরকারি কর্মচারীরা লক্ষ্য করেছিলেন যে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী কোন জমিদার নেই যাদের সঙ্গে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত করা যায়। তাই রীড (Reed) এবং মুনরো (Munro) প্রমুখ মাদ্রাজের সরলকারি কর্মচারীরা প্রস্তাব দিলেন যে জমির প্রকৃত কৃষকের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত স্থির করা হোক। তারা আরও বললেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানিই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কেননা, কোম্পানি জমিদারদের উপর রাজস্বের দাবি বৃদ্ধি করতে পারছে না, যদিও জমিদাররা নিজেদের আয় ভূমিসংস্ক্র ও ভূমি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিল। আরও বড় কথা, কৃষকদের

জমিদারদের মেজাজ-মর্জির ুপর পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এখন রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের কথা বলা হল যে ব্যবস্থায় রায়তকেই জদমির মালিক বলে মানা হল যদি সে তার জমির খাজনা ঠিকসময়ে জমা দিতে পারে। রায়তওয়ারী বন্দোবস্তের প্রবক্তারা দাবি করলেন যে এটি এদেশের সাবেকী ভ্যবস্থারই পুনঃপ্রচলন। শেষপর্যন্ত, মাদ্রাজ ও বম্বে প্রেসিজেডন্সির কিছু অঞ্চলে ঊনিশ/ শতকের প্রথমের দিকে রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করা হল। এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়, বিশ-তিরিশ বছর অন্তর রায়তদের সঙ্গে নতুন শর্তে এটি পুনর্নবীকরণ করা হত। স্বভাবতই নতুন চুক্তিতে রাজস্বের হার বৃদ্ধি পেত।

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ততে প্রকৃতপক্ষে জমিতে রায়তের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হল না। রায়তরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল ছোট ছোট জমিদারের পরিবর্তে এখন একটি সুবৃহৎ জমিদার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর সেই সার্বভৌম জমিদারটির নাম হলো রাষ্ট্র। তারা এখন নিতান্তই সরকারের চাষী ; খাজনা দিতে না পারলে তাদের জমি বিক্রি করে দেওয়া হবে। অধিকাংশ অঞ্চলেই ভূমিরাজস্ব যথেষ্ট উচ্চহারে ধার্য হয়েছিল। মাদ্রাজে সরকার জমির উৎপাদনের ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ নিয়ে নিত রাজস্ব হিসেবে। রাজস্ব বৃদ্ধির অধিকার সরকারের ছিল ; বন্যা বা খরায় শস্যহানি হলেও রাজস্ব রেহাই ছিল না।

জমিদারী ব্যবস্থারই এক পরিবর্তিত রূপ প্রবর্তন করা হয়েছিল গাঙ্গেয় ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে, মধ্যভারতের কিছু অঞ্চলে এবং পাঞ্জাবে যা মহলওয়ারী বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এই ধরনের ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব স্থির হয়েছিল একেকটি গ্রাম বা মহলকে একক ধরে স্থানীয় জমিদার বা পরিবার প্রধানদের সঙ্গে যারা সমষ্টিগতভাবে গ্রামের বা মহলের জমিদার বলে পরিচিত হত। মহলওয়ারী ব্যবস্থাতেও ভূমিরাজস্ব কয়েক বছর অন্তর পরিবর্তিত হত।

কী জমিদারী, কী মহলওয়ারী, কী রায়তওয়ারী সব ব্যবস্থাই এদেশের চিরাচরিত ব্যবস্থার চেয়ে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। ব্রিটিশ এদেশে এধরনের নতুন মালিকানা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল যাতে প্রকৃত কৃষকের কোন সুফল বা উপকার হত না। এখন সারা দেশেই বিক্রয়যোগ্য, বন্ধকযোগ্য এমনকি হস্তান্তরযোগ্য পণ্য হিসেবে প্রতিপন্ন করা হল। এর পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারের রাজস্বকে সুরক্ষিত করা। জমি বিক্রয়যোগ্য কিংবা হস্তান্তরযোগ্য না হলে যে কৃষক বা জমিদারের খাজনা দেওয়ার ক্ষমতা নেই তার কাছ থেকে সরকার খাজনা আদায় করতে পারত না। এখন অসচ্ছল চাষী তার জমির একাংশ বন্ধক বা বিক্রি করে খাজনা মেটাতে পারত। আর তা যদি সে না করত তাহলে সরকার তার জমি নিলাম করে দিয়ে খাজনা উসুল করে নিত। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠার আরও একটি কারণ ছিল ; ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করত যে জমিতে স্থায়ী স্বত্ব প্রতষ্ঠিত হলে জমির মালিক জমির উন্নতিতে সচেষ্ট হবে।

ইংরেজরা এদেশে এই নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে এক বিরাট পরিবর্তন এনে ফেলেছিল। এদশের গ্রাজদীবন যে এযাবৎ একধরনের অনড়তা বা প্রবহমান পরিবর্তনহীনতা ছিল তা নতুন ভূমিব্যবস্থায় ভেঙ্গে পড়লস। গ্রামীণ সংগঠন ও গ্রামজীবন এখন থেকে এক বৃযহত্তর পরিবর্তনের অংশীদার হয়ে উঠল।

৪৩.৬ প্রশাসনিক সংস্কার

শুরুতে কোম্পানি এদেশের প্রশাসনিক কাজকর্ম ভারতীয় কর্মচারীদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল ; প্রয়োজনীয় তদারকি ছাড়া প্রত্যক্ষ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করার তেমন গরজ ছিল না। কিন্তু ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল এভাবে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। ফলত প্রশাসনের কিছু কিছু ব্যাপার নিজের হাতে তুলে নেয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিসের আমলে প্রশাসনের উপরের দিকের পদগুলি পুনর্গঠিত করা হয় স্বদেশের শাসনকাঠামো অনুযায়ী। কিন্তু যতই ব্রিটিশ শক্তি নতুন নতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হতে লাগল, নতুন নতুন সমস্যাও তৈরি হল। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যটি স্থি% রেখে শাসনব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর দরকার হল।

অধ্যাপক বিপানচন্দ্র মনে করেন ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার তিনটি প্রধান স্তমভ ছিল : সিভিল সার্ভিস, সেনাদল এবং পুলিশ। ব্রিটিশ প্রশাসনের মুখ্য উদ্দেস্য ছিল এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কেননা শান্তি-শৃঙ্খলা স্থায়ী না হলে ব্যবসা-বাণিজ্য নিরুপদ্রবে করা যাবে না। এদেশে ব্রিটিশরা ছিল বিদেশী ; সুতারং ভারতবাসীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করা তাদের বিবেচনায় সুদুর পরাহত ছিল। স্বাভাবতই জনবাদী প্রশাসকের ভূমিকার পরিবর্তে ব্রিটিশ এদেশ শক্তিশালী শাসকের ভূমিকার কথা ভাবছিল। বস্তুত কর্ণওয়ালিস সিভিল সাভিসের প্রবর্তন করেছিলেন এই লক্ষ্য সামনে রেখে। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি যখন ভারতে আসেন, তাঁর প্রধান লক্ষ্যই ছিঠল প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করা। কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন কোম্পানির কর্মচারীদের যথোপযুক্ত বেতন না দিলে এ-কাজটি সম্ভব নয়। তাই প্রথমেই তিনি কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করলেন। কোনরকম উৎকোচ বা উপহার গ্রহণের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিলেন। একই সঙ্গে তিনি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করলেন। যেমন জেলার কালেক্টরদের মাসিক বেতন নির্ধারিত হল ১৫০০ টাকা ; এর উপর জেলার আদায়ীকৃত রাজস্বের এক শতাংশ কমিশনের ব্যবস্থা হল। বস্তুত কোম্পানির সিভিল সার্ভিসের বেতন এই সময় সারা বিশ্বে ছিল সর্বোচ্চ।

লর্ড ওয়েলেসলী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে এদেশে তরুণ সিভিল সার্ভেন্টদের প্রশিক্ষণের জন্য। কোম্পানির ডিরেক্টররার অবশ্য এ-কাজটি অনুমোদন করেননি। শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে একই উদ্দেশ্যে হেইলেবেরী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে স্থির হল সিভিল সার্ভিসের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল যে ভারতীয়দের পুরোপুরি বর্জন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল বছরে ৫০০ পাউণ্ড বা তদূর্ধ বেতনের পদগুলি সাহেবদের জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। এই সিদ্ধান্তের পিচনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ সরকার বিশ্বাস করত ব্রিটিশ ধ্যানধারণা ও রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রশাসন ব্রিটিশ আমলাদের মাধ্যমেই সবচেয়ে ভাল চালানো যাবে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের সততার উপর ব্রিটিশদের আস্থা ছিল না। কর্ণওয়ালিস বিশ্বাস করতেন, 'হিন্দুস্তানের প্রতিটি মানুষই হলো দুর্নীতিগ্রস্ত।' কর্ণওয়ালিস ভুলে গিয়েছিলেন, এদেশে ব্রিটিশ আমলাদের ক্ষেত্রেও কথাটি সমান সত্যি।

তিনি ব্রিটিশ আমলাদের বেতন বৃদ্ধি করে এই রোগটি নিরাময়ের চেষ্টা করেছিলেন ; কিন্তু ভারতীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে একই ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁর প্রবল অনীহা ছিল।

আসলে, সরকারি উচ্চপদ থেকে ভারতীয়দের অপসারণ ব্রিটিশরা ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিল। সিভিল সার্ভিসের উদ্দেশ্যই ছিল এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে স্থায়ী ও সুস্থির করা। আর এ-কাজটি ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়ে যে হবে না তা ব্রিটিশরা ভাল করেই বুঝেছিল। তাছাড়া, ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষরাও চায়নি যে সিভিল সার্ভিসের মতো লোভনীয় পদগুলিতে ভারতীয়দের গ্রহণ করা হোক। এই মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলি পেতে তারা নিজেদের মধ্যেই রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিল। আর অপেক্ষাকৃত নিচের পদগুলিতে যেখানে সম্মান, মর্যাদা ও বেতন তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে ভারতীয়দের বিপুল পরিমাণে নিয়োগ করা হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল সেনাদল। সেনাদলের মাধ্যমে ব্রিটিশ এদেশে চারটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করেছিল। (ক) ভারতীয় রাজন্যবর্গকে পরাহত করতে সেনাদলের ভূমিকা ছিল অপরিসীম, (খ) বৈদেশিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাত থেকে সেনাদল ভারতীয় সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেছিল, (গ) আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ-আন্দোলন থেকে সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়েছিল, (ঘ) ভারতীয় সেনাদলের মাধ্যমেই ব্রিটিশ তাদের এশীয় ও আফ্রিকার সাম্রাজ্য রক্ষা ও সম্প্রসারণ সম্ভব করেছিল।

কোম্পানির সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ছিল ভারতীয়। আধুনিক উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে বহু ভারতীয় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে, মহাবিদ্রোহের সময়ে, ভারতীয় সেনাদলে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩,১১,৪০০ ; এর মধ্যে ২,৬৫,৯০০ জন সেনা ছিল ভারতীয়। সেনাবাহিনীর অফিসাররা ছিলেন অবশ্য পপুরোপুরি ব্রিটিশ, বিশেষত কর্ণওয়ালিকের আমলে। ভারতীয় সিপাইদের বেতন ছিল কম, পদোন্নতির সুযোগ ছিল আরও কম। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিশি সেনাদলে মাত্র তিনজন ভারতীয় সেনার মাসিক বেতন ছিল ৩০০ টাকা আর ভারতীয়দের ক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ ছিল সবেদার পদ পর্যন্ত। ভারতীয়রা ব্রিটিশ সেনাদলে সুযোগ পেয়েছিল কেননা ব্রিটিশ সেনা নিয়গো করা ব্যয়বহুল বিবেচিত হয়েছিল। তাছাড়া বিপুল সংখ্যায় ব্রিটিশ সেনা মেলাও সহজ ছিল না, কেননা ব্রিটেনের জনসংখ্যা ছিল বিরাট ভারতীয় সেনাদলের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। তবে কিছু ব্রিটিশকে সাধারণ সেনাপদে নিয়োগ করা হয়েছিল যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতীয় সিপাইদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এত কমসংখ্যক ব্রিটিশ সেনার নেতযৃত্বে বিপুল ভারতীয় সিপাইরা যে এদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারেই সহযোগী হয়েছিল তা দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, ঐ সময় আধুনিক জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোধঝায় তা এদেশে ছিল না। বিহারের একজন সিপাই ভাবতে পারত না যে সে পাঞ্জাবী বা মারাঠীদের দমন করতে কোম্পানিকে সাহায্য করছে বা সে এভাবে ভারত-বিরোধী কাজ করছে। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সিপাইদের রাজশক্তির কাছে আনুগত্যের একটি পরম্পরাগত ঐতিহ্য ছিল। যার নুন খেয়েছি, তার গুণ গাইব—এই ছিল তাদের সনাতন বিশ্বাস। কোম্পানি তাদের বেতন দিত নিয়মিত। সুতরাং কোম্পীনকে সেবা করা ছিল তাদের ধর্ম।

ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল পুলিশবাহিনী। ভারতে পুলিশী ব্যবস্থা গড়ে তোলার

কৃতিত্ব হল কর্ণওয়ালিসের। তিনি জমিদারদের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব থেকে অব্যবহতি দেন ; পরিবর্তে শান্তিরক্ষার ভার পড়ল স্থায়ী পুলিশবাহিনীর উপর। ভারতীয় প্রাচীন থানা-ব্যবস্থারই তিনি আধুনিকীকরণ করলেন। প্রত্যেক থানায় তিনি ভারতীয় দারোগার উপর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার দিলেন। আরও পরে, জেলা পুলিশ আধিকারিকের (District Superintendant of Police) পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল যার উপর জেলা পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। পুলিশ বিভাগের যাবতীয় উচ্চপদেও ভারতীয়দের নিয়োগ-সম্ভাবনা ছিল না। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার ছিল চৌকিদারের উপর যাদের বেতন বাবদ ব্যয় বহন করত সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসী। পুলিশী ব্যবস্থায় নানা অপরাধের ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছিল ; বিশেষত গ্রামীণ ডাকাতির সংখ্যা কমে গিয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-দমনেও পুলিষ যথেষ্ট তৎপতা দেখাত।

৪৩.৭ বিচারব্যবস্থা

ব্রিটিশরা এদেশে আধুনিক বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস বিচারব্যবস্থার গোড়াপত্তন করলেও প্রকৃত বিচার-কাঠামো গড়ে উঠেছিল কর্ণওয়ালিকের আমলে। প্রতিটি জেলাতে স্থাপিত হয়েছিল দেওয়ানী আদালত। দেওয়ানী আদালতের সর্বোচ্চ বিচারক হলেন জেলা-জজ। কর্ণওয়ালিস এইভাবে সিভিল জজ ও কালেক্টরের পদদুটিকে পৃথক করে গড়ে তুললেন। জেলা কোর্ট থেকে প্রথমে চারটি প্রাদেশিক আপীল আদালতে আবেদন করা যেত। মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হতে পারত সদর দেওয়ানী আদালতে। জেলা আদালতের নিচে ছিল বিচারক পরিচালিত রেজিস্ট্রারের আদালত এবং ভারতীয় বিচারক পরিচালিত মুন্সেফ ও আমীনের আদালত।

ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য কর্ণওয়ালিস বাংলা প্রেসিডেন্সীকে চারটি ভাবে ভাগ করে প্রত্যেকটিতে ভ্রাম্যমান আদালত (Court of Circuit) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বিচারালয়গুলিতে বিচারের ভার ছিল ইংরেজ সিভিল সার্ভেন্টদের উপর। সার্কিট কোর্টের নিচে ছিল ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট পরিচালিত অনেকগুলি বিচারালয় যেখানে ছোটখাটো মামলার বিচার হত। সার্কিট কোর্ট থেকে সদল নিজামত আদালতে আপীল করা যেত। ফৌজদারী আদালতে মোটের উপর মুসলিম ফৌজদারী আইন বলবৎ করা হত। আর দেওয়ানী আদালতগুলিতে দেশ-অঞ্চলের প্রচলিত প্রথা ও আচারকে মান্যতা দেওয়া হত।

প্রাদেশিক আপীল ও সার্কিট কোর্টগুলি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক তুলে দেন। এইসব আদালতের কাজগুলি প্রথমে কমিশন ও পরে জেলা-জজ ও জেলা কালেক্টরদের উপর ন্যস্ত করা হয়। বেন্টিঙ্ক বিচারকদের পদমর্যাদা ও পদোন্নতি ঘটান। তাঁর আমলে ভারতীয় বিচারকরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-অর্ডিনেট জজ (Subordinate Judge) ও প্রধান সদর আমীনের পদ লাভ করতে পারত। ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজে হাই কোর্ট (High Court) স্থাপিত হল আর সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত তুলে দেওয়া হল।

দেশীয় আইন, প্রথা ও রীতি-নীতির উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ আমলের আইন গড়ে উঠলেও

ব্রিটিশরা এদেশে শরিয়ত ও শাস্ত্রের বিধান ছাড়াও নতুন আইন রচনা করেছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে আইনে প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। ঐ বছরেই সরকার লর্ড মেকলের (Lord Macauley) সভাপতিত্বে একটি আইন কমিশন (Law Commission) স্থাপন করেছিল প্রচলিত ভারতীয় আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য। এই কমিশনের প্রচেষ্টাতেই বিখ্যাত ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) রচিত হয়েছিল।

তত্ত্বগতভাবে, ইংরেজরা এদেশে আইনের অনুশাসন (The Rule of Law) প্রতিষ্ঠা করেছিল। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল প্রশাসন আইন মোতাবেক কাজ করবে। প্রজাবর্গের অধিকার, বিশেষ সুবিধা এবং নাগরিক কর্তব্য সবই সুস্পষ্ট আইনের নির্দেশে নির্ধারিত হবে, শাসকের খেয়ালখুশিমতো নয়। কিন্তু বাস্তবিক প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর অন্যথা হত প্রায়শই। কেননা, সরকারি আমলা আর পুলিশ কার্যক্ষেত্রে অনেকটা স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা ভোগ করত। আইনের চোখে সমানাধিকার (Equality before Law0 ছিল এমনই একটি ধারণা। জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে আইন সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযুক্ত হবে—এইটিই ছিল এই ধারণার মূলকথা, কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ইওরোপীয় বিচারকের কাছে ইওরোপীয় অপরাধী লঘু দণ্ডাদেশ পেত ; পক্ষান্তরে একই অপরাধে ভারতীয়দের শাস্তি হতো বেশি। বহু ইংরেজ কর্মচারী, সামরিক অফিসার, বাগিচা মালিক এবং ব্যবসায়ী ভারতীয়দের সঙ্গে অবর্ণনীয় দুর্ব্যবহার করত ; কিন্তু নিপীড়িত ভারতীয়তার সুবিচার প্রার্থনা করলে ইওরোপীয় বিচারক দুর্বিনীত ইংরেজ অপরাধীকে প্রায়ই লঘুদণ্ড দিয়ে ছেড়ে দিত। উপরন্তু, সুবিচার পাওয়া এখন রীতিমতো ব্যয়সাধ্য হয়ে উঠল, কেননা আদালতের ফী, উকিলের ফী কিংবা সাক্ষীর জন্য খরচ-খরচা রীতিমতো ব্যয়বহুল ছিল। আদালত গড়ে উঠেছিল গ্রাম থেকে বহু দূরে, শহরে। মামলা চলত জটিল, ব্যয়বহুল দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায়। ফলে গরিব লোকের পক্ষে সুবিচার পাওয়া দুরূহ ছিল।

৪৩.৮ শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি

এদেশে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে ব্রিটিশদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। এ-কথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে সরকারই একমাত্র ভূমিকা নিয়েছিল। খ্রিস্টীয় মিশনারী এবং বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ও এ-ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ-দেশে প্রথম দিকে ভারতীয়দের শিক্ষা-বিস্তারের ব্যাপারে তেমন উদ্যোগ দেখায়নি, কেননা কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল এদেশে লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য করা। অবশ্য দু'একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রম যে ছিল না, এমন নয়। যেমন, ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলিম আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য কলকাতা-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে যোনাথান ডানকান (Jonathan Duncan) বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ গড়ে তুলেছিলেন প্রধানত হিন্দু আইন ও দর্শন বিষয়ে পঠন-পাঠনের জন্য। সুতরাং এই দু'টি প্রতিষ্ঠানেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয় নিয়মিত সরবরাহ করা।

মিশনারীরা খুব শীঘ্রই এ-দেশে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকারকে

চাপ দিতে থাকে। মানবতাবাদী জ্ঞানদীপ্ত ভারতীয় বিদ্বৎজনরা বিশ্বাস করতেন যে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা দুর করার মুখ্য উপায় হল আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা অধিগত করা। অন্যদিকে খ্রিস্ট-মিশনারীরা এ-দেশে শিক্ষাবিস্তারের উৎসাহ দেখিয়েছিল প্রধানত এই কারণে যে াধুনিক শিক্ষা দেশীয় লোকেদের ননে নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে অশ্রদ্ধা এনে দেবে এবং তারা খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবে। সুতরাং শিক্ষাবিস্তারে সরকারের প্রথম উৎসাহ দেখা গেল ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে যেখানে এদেশে আধুনিক বিজ্ঞাননিষ্ঠ শিক্ষাবিস্তারে সরকারি প্রয়াসকে নীতিগতভাবে স্বীকযৃতি দেওয়া হল। আইনে কোম্পানিক বছরে একলক্ষ টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হল। তবুও ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত এই সামান্য অর্থও কোম্পানি শিক্ষাখাতে ব্যয় করতে পারেনি।

এর পিছনে অবশ্য একটি গুরুতর কারণ ছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে এই বরাদ্দ অর্থ কী জাতীয় শিক্ষাবিস্তারে ব্যয়িত হবে সে বিষয়ে ঐক্যমত হচ্ছিল না। একদল মানুষ চাইছিলেন যে বরাদ্দ অর্থ শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারেই খরচ করা হোক ; অন্যদিকে আর একটি দল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পাশাপাশি দেশীয় শিক্ষা প্রসারের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন। এমনকি যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর জোর দিচ্ছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হবে কী ভাষা, সে-নিয়েও তাঁরা বিতর্কে মেতেছিলেন। একদল চাইলেন মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ; অন্যদল ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম করতে চাইছিলেন। এছাড়া আরও নানারকমের জটিলতা ছিল। অনেকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ভাষা এবং অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে ইংরেজীর পার্থক্য নিরূপণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তেমনি, এদেশে দেশীয় মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং দেশীয় সংস্কৃতির অধ্যয়ন-অনুশীলনমূলক শিক্ষার মধ্যেও যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি ছিল।

যাইহোক, প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের শিক্ষা-সংক্রান্ত এই বিরোধ ও মতদ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নিষ্পত্তি হল। সরকার এইসময় স্থির করলেন যে বরাদ্দ অর্থ এরপর থেকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনেই ব্যয়িত হবে এবং শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজী। গভর্ণর-জেনারেল বেন্টিকের কাউন্সিলের আইন-সদস্য লর্ড মেকলে (Lord Macualy) যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে সম্ভব নয়, কেননা কোন ভারতীয় ভাষাই আধুনিক পাশ্চাত্যে শিক্ষা পরিবেশনের উপযোগী উন্নত হয়ে ওঠেনি। উপরন্তু প্রাচ্য শিক্ষা ইওরোপীয় শিক্ষার চেয়ে নিকৃষ্টতর, একথা সত্যি যে মেকলের বক্তব্যের ম্ধ্য দিয়ে প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞানতাই প্রকাশ পাচ্ছিল ; কিন্তু এ-কথাও সত্যি যে এই সময় ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষত ব্যবহারিক বিজ্ঞান, যথেষ্ট উন্নত ছিল।

এই কারণেই শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের প্রতি তীব্র আকুলতা ছিল। রামমোহন রায়ের মনে হয়েছিল আধুনিক পশ্চিমী বিজ্ঞান ও গণতান্ত্রিক ভাবধারার মধ্যে অধঃপতিত ভারতের উন্নয়নের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে। সাবেকী শিক্ষা ভারতবাসীর মনে এনেছে বহু কুসংস্কার ও কর্মবিমুখতা। স্বভাবতই রামমোহন প্রমুখ অনেকেই এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাই এদেশের স্কুল-কলেজে ইংরেজীকেই শিক্ষাবিস্তারের

মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করলেন। প্রচুর প্রাথমিক স্কুল খোলার চেয়ে বেশ কয়েকটি ইংরেজী মাধ্যম স্কুল-কলেজ খোলার জন্যই সরকার উৎসাহ দেখালেন। সরকারের এই নীতি পরবর্তীকালে সমালোচিত হয়েছিল। আসলে নীতিগতভাবে এই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এর ফলে গণশিক্ষা অবহেলিত হয়েছিল। সরকার ইংরেজী মাধ্যম স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দিলে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান যেত। কিন্তু সরকার তা করতে চায়নি মূলত অর্থনৈতিক কারণে। গণমুখী শিক্ষা প্রচলনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল ব্যয়কুণ্ঠ ঔপনিবেশিক সরকার তা সরবরাহ করতে প্রস্তুত ছিল না। পরিবর্তে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিলেন তাকে 'downward filtration theory' বলা হয়। বলা হল, পাশ্চাত্য শিক্ষা সমাজের উপরতলার মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে পৌঁছালে তা ধীরে ধীরে পরিশ্রুত হতে হতে সমাজের নিচের তলার মানুষদের কাছে পৌঁছাবে। এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য সরকার উচ্চশ্রেণীর মানুষদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য স্কুল-কলেজ গড়ে তুললেন।

সরকারের এই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য সফল হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষা গণমধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। তবে পশ্চিমী শিক্ষা গ্রামে-গঞ্জে না পৌঁছালেও, পশ্চিমী ভাব-আদর্শ সুদূর প্রসারিত হয়েছিল। স্কুল-কলেজের মাধ্যমে না হলেও, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, ইস্তেহার, সাহিত্য ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতীয়রা গ্রামে ও শহরে গণতান্ত্রিক আদর্শ, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা ইত্যাদি ভাবাদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিল, যা ব্রিটিশের ঘোষিত শিক্ষানীতির অভিপ্রেত ছিল না।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের সভাপতি চার্লস উড (Charles Wood) এ-দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশনামা পাঠান। এই নির্দেশনামায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনার সুপারিশ ছিল। এই সুপারিশক্রমে শিক্ষা সরকারের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে পরিগণিত হল। 'Downward Filtration theory' কাগজ-কলমে পরিত্যক্ত হল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হলেন ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দু'জন গ্রাজুয়েটের একজন।

প্রকৃতপক্ষে, এদেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার থেকে এমন সদিচ্ছা ব্রিটিশ সরকারের ছিল না। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছিল স্বল্পব্যয়ে প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কেরানী সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। শিক্ষাবিস্তারের আর একটি উদ্দেশ্য হল এদেশে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার বিস্তৃত করা। রাজনৈতিক দিক থেকে ব্রিটিশরা আর একটি উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় ভারত-বিজেতা ব্রিটিশদের অবিমিশ্র প্রশংসা ছিল। ভারতীয়দের ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরক্ত করে তুলতে পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

ব্রিটিশ শিক্ষানীতির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল গণমুখী শিক্ষাবিস্তারের প্রতি সচেতন অবহেলা। এর ফল হয়েছিল এই যে এদেশে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে সাক্ষর লোকের সংখ্যা যা ছিল তা একশ বছর পর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেও বিশেষ একটা হেরফের হয়নি। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে এদেশে ৯৪ শতাংশ ভারতীয় নিরক্ষর ছিল ; আর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ৯২ শতাংশ। দেশীয় ভাষারক পরিবর্তে ইংরেজীকে শিক্ষার

মাধ্যম করার ফলে শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়নি। উপরন্তু শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের মধ্যে একটি বড় রকমের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ব্যবধান রচিত হয়েছিল। তাছাড়া স্কুল-কলেজে শিক্ষার জন্য ছাত্রদের বেতন দিতে হত বলে পাশ্চাত্য শিক্ষা রীতিমতো ব্যয়সাধ্য ছিল। ফলত পাশ্চাত্য শিক্ষা ধনী শহরবাসীদেরই একচেটিয়া হয়ে যায়। যে সনাতন শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্রিটিশ সরকার ধ্বংস করে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিল, শতাধিককাল ধরেও সে বিনষ্ট কাঠামোর উপযুক্ত পরিবর্ত সরকার এদেশ তৈরি করতে পারেনি। আরও একটি বড় রকমের সাফল্য ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থায় রয়ে যায়। নারীশিক্ষা প্রথম দিকে পুরোপুরি উপেক্ষিত হয়েছিল। এজন্য কোন সরকারি অর্থবরাদ্দও ছিল না। রক্ষণশীল ভারতীয়দের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে—এমনতর আশংকা নারীশিক্ষায় সরকারি অনীহার কারণ হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড়ল কারণ হল নারীশিক্ষা বিসল্তারের দ্বারা ঔপনিবেশিক সরকারের কোন আশু প্রয়োজন সিদ্ধ হবার সম্ববানা ছিল না। কেননা শিক্ষিত নারীদের সেযুগে সরকারি কেরানী হিসেবে নিয়োগে সাংস্কৃতিক অসুবিধা ছিলড়। এর ফল হয়েছিল এই যে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দেও মাত্র ২ শতাংশ ভারতীয় নারী লিখতে পপড়তে পারত। কোম্পানির প্রশাসন এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকেও অবহেলা করেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সারা দেশে মাত্র তিনটি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে। আর একটিই মাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রুরকিতে। আর এই সবকিছুর মূলে প্রধান প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থ। শিক্ষাখাতে ব্রিটিশ সরকার অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল না। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে সরকার এদেশের রাজস্ব আদায় করেছিল ৪৭ কোটি টাকা, আর তা থেকে শিক্ষাখাতে খরচ করেছিল মাত্র এক কোটি।

৪৩.৯ সারাংশ

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর কোম্পানির প্রশাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ করে। কোম্পানির হাত থেকে পার্লামেন্টে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক ভারতে লক্ষ্য করা যায় এখানেই তার সূচনা হয়েছিল। রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হওয়ায় ১৭৮৪ সালে রাজা তৃতীয় জর্জের হস্তক্ষেপে প্রধানমন্ত্রী পিট একটি বিল পার্লামেন্টে নিয়ে এলেন এবং সেটি 'পিটের ঙভারত আইন' নামে পাশ হল। এই আইন সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী হয়েছিল। এটি একটি সাধারণ প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করেছিল যা ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল।

ভারতস্থিত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যখন থেকে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে তখনই ভারতবর্ষে শাসনতন্ত্রের উদ্ভব হয়। কোম্পানি শাসিত ভারতবর্ষে দ্বৈত-শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল যার কুফল বাংলার রাজনীতি ও অর্থনীততে মারাত্মকভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পরাশির যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচার, অর্থলোলুপতা এবং কোম্পানির আভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ত্রুটি ব্রিটিশ পার্লামেনন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে সে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে তার সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যাপারটি ব্রিটিশ রাজনৈতিকগণ উপলব্ধি

করেন। ইতিমধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত এবং ভারতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাই ভারতস্থিত কোম্পানির শাসকবর্গ এবং ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও লন্ডনস্থিত সাসকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে ভারতস্থিত কোম্পানির সরকার সম্পর্কিত সাংবিধানিক সংস্কারগুলি একের পর এক গৃহীত হতে দেখা যায়। ভারতের তৎকালীন বিবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপের প্রথম ফলশ্রুতি ছিল ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট যা ছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের প্রথম লিখিত সংবিধান। এরপর ১৭৯৩ সালে পর্যন্ত প্রতি দশ বছর অন্তর এবং ১৭৯৩ সালের পর থেকে ১৮৫৩ সাল পর্যন্ত প্রতি কুড়ি বছর অন্তর কোম্পানির সনদ মঞ্জুর করার প্রথা প্রচলিত হয়। প্রতিবারই কোম্পানির গঠন ও ভারতে কোম্পানির শাসন ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তার নিয়ন্ত্রণ তথা ব্রিটিশ সরাকরের প্রাধান্য বৃদ্ধি করে। এইভাবে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন বিষয়ে আইন রচনা করে ভারতীয় সামমরাজ্যের শাসন ও দায়িত্বভার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পারি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তথা ইংল্যান্ডের রানীর হস্তান্তরিত কারর একটি ধারাবাহিক প্রয়াস ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পরিচালিত করেছিল।

৪৩.১০ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রশাসনিক ও বিচারবিভাগীয় সংস্কারগুলি আলোচনা করুন।

২। বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলো কেন? বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব কীরকম হয়েছিল?

৩। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করুন।

৪। ব্রিটিশদের ভূমি-রাজস্ব নীতি কিভাবে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভূমি সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছিল?

৫। ভারতে নতুন শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? তার বিশদ বিবরণ দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্টের মূল ধারণাগুলি কী ছিল? এর কী কী ত্রুটি ছিল?

২। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার একটি বিবরণ দিন।

৩। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা কেন প্রবর্তিত হল? এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৪। রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী ভূমিব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব বিবেচনা করুন।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। পিটের ভারত-আইন কবে তৈরি হয়েছিল ?

২। 'কর্ণওয়ালিক কোড' বলতে কী বোঝেন ?

৩। স্যার জন শোর কে ছিলেন ?

৪। 'ভ্রাম্যমান কমিটি' বলতে কী বোঝায় ?

৫। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' কে কবে প্রবর্তন করেছিলেন ?

৬। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ?

৭। 'উড'-এর নির্দেশনামা কী ?

৮। 'এশিয়াটিক সোসাইটি' কে কবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ?

৪৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Pylee, M. V. : Constitutional History of India, Second Edition, 1995.

২। Aggarwal, R. C. : Constitutional Development of India and National Movement, Ninth Edition, 1994.

৩। Firminger, W. K. : Fifth Report from the Select Committee of the House of Commons, Calcutta, 1917.

৪। Guha, Ranjit : A Rule of Property for Bengal, 1962.

৫। Mukherjee, Nilmani : The Ryotwari System in Madras, 1962.

৬। Basu, Aparna : Growth of Education and Political Development in India.

৭। Grover, B. L. & Grover, S. : A New look at Modern India History, 1997.